# কাল বোশেখী ঝড়

শুজা রশীদ

হঠাৎ করে খবর এলো ঝিমার শরীর খুবই খারাপ। তার নানান ধরনের অসুখ বিসুখ ছিলো। গ্রাম থেকে এক লোক খুলনায় এসেছিলো কাজে তার মুখেই খবরটা শুনলাম। ঝিমা খুবই ভেঙ্গে পড়েছে। সে বিশেষ করে আমাকে দেখতে চায়। মায়ের অবস্থাও বিশেষ সুবিধার নয়। তার বেঢপ সাইজের পেট নিয়ে বাথরুমে যাওয়াও এক ঝামেলা। তবুও মা লোকটিকে দিয়ে বলে পাঠালো দাদু নিতে এলে আমরা তার সাথে যাবো। মানুষের বাঁচা মরার তো কোন ঠিক নেই। বেচারী ঝিমাকে একবার শেষ দেখা দেখতে না পেলে সারাটা জীবন দুঃখ থেকে যাবে।

দাদু খবর পাবার পরদিনই চলে এলেন। তার মুখে জানা গেলো ঝিমা একেবারেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছে। তার শরীরে প্রচন্ড পানি জমেছে। নড়াচড়া করতে পারে না। খাওয়া দাওয়া প্রায় করেই না। যখন তখন অবস্থা। যতই দিন যাচ্ছে আমাকে দেখবার জন্য সে ততই পাগল হয়ে উঠছে। এই সমস্ত শুনে মায়ের মন আরো খারাপ হলো। আমরা পথে অনেক বাধা-বিপত্তি হতে পারে জেনেও পরদিন বেরিয়ে পড়লাম। কোন একটা গোলমালে খুলনা-সাতক্ষীরার স্বাভাবিক যানবাহন চলাচল করছে না। আমরা স্কুটার, রিক্সা, পায়ে হেটে অনেক কষ্ট স্বীকার করে সন্ধ্যার দিকে কালিগঞ্জে এসে পৌঁছলাম। মায়ের অবস্থাই এবার বেগতিক। সারাদিনের এতো ধকল সহ্য করবার মতো শারীরিক অবস্থা তার নয়। তবুও ভালো যে নদী পার হতেই গরুরগাড়িসহ আলেকের দন্ত বিকশিত হাস্যময় মুখখানি দেখা গেলো। মা গাড়িতে উঠেই হাত পা ছড়িয়ে ফ্লাট হয়ে গেলেন। তার পাশে রুশী। গাড়ির প্রতিটি নড়াচড়ায় মা উহ্ আহ্ করছেন। রুশী তার সাথে গলা মেলাচ্ছে। এই মেয়েটার কি কখনো বুদ্ধি সুদ্ধি হবে না? দাদু যাবার সময় তার সাইকেলটাকে স্থানীয় একটি দোকানে রেখে গিয়েছিলেন। আমি তার সাইকেলের সামনের স্ট্যান্ডে বসেছি। কিন্তু আমরা যাচ্ছি খুবই আস্তে আস্তে, গরুর গাড়ির সাথে তাল মিলিয়ে। প্রায়ই সাইকেল থামিয়ে গাড়ির সাথে সাথে হাঁটছি। মায়ের অবস্থা দেখে দাদুও বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। একটু পর পরই উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইছেন- তুমি ঠিক আছো তো বৌ মা? এইতো এসে পড়লাম।

আলেক মিয়া এক পর্যায়ে গান ধরলো - ও পবনের নাউরে .....

দাদু তৎক্ষনাৎ তাকে কড়া একটা ধমক দিলেন। আলেক, মুখটা বন্ধ রাখ। আলেক একেবারে নিঃশব্দ হয়ে গেলো। দাদুর মেজাজ বড় কড়া। সবাই তাকে সমঝে চলে। আমি দাদুর অনুমতি নিয়ে গরুর গাড়িতে আলেকের পাশে উঠে বসলাম। আলেক তার হাতের চিকন লাঠিটা আমার হাতে ধরিয়ে দিলো। - দে গরুগুলো একটু তাড়া দে তো। বেশী জোরে মারবি না। ওরা ব্যথা পাবে।

আমি খুবই মোলায়েম করে একটা বাড়ি দেই লালরঙের গরুটার পিঠে। - হাট্, হাট্।

সে ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে একটা মায়াভরা  চাহনি দেয়। আলেক বললো - এইটা তোর গরু। ঝিমা এইটা তোকে দিয়ে দিছে। আর এই কালা গরুটা তোর দাদুর।

আমি ওর কথায় খুবই অবাক হয়ে যাই। –এই লাল গরুটা আমার?

- হ্যাঁ। ঝিমার আরো তিনটা গরু আছে। একটা গাভী তার মধ্যে। সেইটা আবার পোয়াতি হইছে। ঝিমা বলছে সে মরে গেলে তার সব গরু, সম্পত্তি তোর হবে। তুই মোড়ল বংশের বড় পোতা। ঝিমা তোকে ছোটবেলায় বুকে পিঠে করে পালছে, তোর উপরে তার অনেক মায়া। তারে কষ্ট দিসনা, বুঝলি?

আদর কে না বোঝে? ঝিমা যে আমাকে খুবই ভালোবাসে সে তো আমি জানিই। কিন্তু এই লাল গরুটা যে আমার এটা জেনে মনটা ভয়ানক আনন্দে ভরে উঠলো। আমি আলেককে বললাম - এই লাল গরুটাকে বেশী মেরো না, আলেক ভাই।

আলেক হা হা করে হেসে উঠলো। - আরে বোকা, আমি কি ওদের মারি? একটু গুতা দেই নইলে ওরা ঝিমায়ে পড়ে। অবলা প্রাণ ওদের কেন ব্যথা দিবো।

সন্ধ্যার শান্ত পরিবেশে তার হাসিটা বোধহয় বেশী করে কানে লাগলো কারণ তাকে আবার দাদুর ধমক খেতে হলো। –মুখটা একটু বন্ধ রাখ আলেক।

- জ্বি চাচা।

সে আমার দিকে তাকিয়ে দাদুকে আড়াল করে চোখ টিপে।

দাদু বাড়িতে পৌঁছে দেখি এলাহি কান্ড। ঝিমার যখন তখন অবস্থা শুনে আমাদের আত্মীয় স্বজনরা সবাইতো এসেছেই, গ্রামের যাবতীয় মানুষজনও হুমড়ি খেয়ে পড়েছে উঠোনে। পা ফেলবার জায়গা নেই যেন। উঠোনের এক পাশে ঝিমার পৃথক ঘর। সেই ঘরের অপ্রশস্ত মেঝেতে একটা মাদুরে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে ঝিমা। তার পাশে গ্রামের কবিরাজ চাচা এবং এলোপ্যাথিক ডাক্তার চাচা দু'জনই আছেন। উঠোনের চারদিকে কম করে হলেও চার-পাঁচটা হ্যাজাক বাতি জ্বলছে। বিশাল উঠোনটা আলোয় আলোময় হয়ে আছে। দহলিজ ঘরের সামনের এলাকাটা গরুর গাড়িতে ভরে গেছে। যারা দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন, তারা সেই সব গাড়িতে করে এসেছেন। বিশেষ করে মেয়েদের পক্ষে পাঁচ-ছয়-দশ মাইল পথ হেঁটে আসাটা অসম্ভব কাজ। গ্রামের সাধারণ মেয়েদের জন্য অসম্ভব নয় কিন্তু গৃহস্থ বাড়ির মেয়েরা এতে ঠিক অভ্যস্ত নয়।

আমাদেরকে দেখেই ভীড়ের মধ্যে একটা আচমকা আলোড়ন উঠলো। শহীদ চাচা চীৎকার করে বললেন- খোকারা এসে পড়ছে ও খোকার ঝিমা, চোখ খোল। খোকারা এসে পড়ছে। পথ দাও, পথ দাও। জলদি আসো খোকা, তোমারে দেখবার জন্যই যেন বুড়ী বেঁচে আছে এখনো।

ভীড় ঠেলে মা, আমি ও রুশী ঝিমার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই। ঝিমার শরীর ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। তার চোখ বন্ধ। আমার নাম শুনে সে চোখ খুলে একবার তাকালো। তার ঘোলাটে দৃষ্টি দেখে মনে হলো না সে কিছু দেখছে। মা ক্লান্ত ভঙ্গীতে তার পাশে বসে পড়লেন।

- ও দাদীমা , দাদীমা, দেখো খোকা এসেছে। আমার কথা শুনতে পাও?

চাচু কখন আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন খেয়ালই করিনি। তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন - দাদীমা দুপুর থেকে কথাবার্তা আর বলছেন না। খোকা যাও তো বাবা, ওনার হাত ধরে একটু বসো।

আমি শান্ত ছেলের মতো তাই করি। কোন লাভ হয় না। ঝিমা দুই চোখ বন্ধ করে মড়ার মতো শুয়ে থাকে। আমি চারদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে লক্ষ্য করি শুধু চাচু নয়, চাচী, মীনু আপা এবং আমার নানার বাড়ির অনেকেই এসেছেন, এমনকি নানাও। মা নানাকে দেখেই অকারনে হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলেন। নানা মায়ের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন- ভাবিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে, তুই ঘরে গিয়ে শুয়ে একটু বিশ্রাম নে। আমরা তো সব এখানেই আছি। মায়ের কান্নার জোর আরো বাড়লো। ঠিক সেই সময়েই আমি লক্ষ্য করলাম ভীড়ের মধ্যে মামা, মামী ও রানী আপাকে। আমাকে দেখে হাত নাড়লো রানী আপা। আমি একগাল হাসি দিয়ে জোরে জোরে পাল্টা হাত নাড়লাম। মনটা ঝট করেই ভাল হয়ে গেলো।

সেদিন সারাটা রাত আমাদের প্রায় কারোরই ঘুম তেমন একটা হলো না। উঠোনেই অধিকাংশ মানুষ মাদুর পেতে বসে পড়েছিলো। গরমের সময় বলে খুব একটা অসুবিধা হলো না। আমরা ছোটরা - আমি, রুশী, রানী আপা, মীনু আপা সবাই দাদীর বিছানায় শয্যা নিলাম। রুশী ঝট করে ঘুমিয়ে গেলেও আমরা বাকি তিনজন অনেকক্ষণ জেগে থাকলাম। নানান গল্পে আসর জমে উঠলো। এরই মধ্যে কখন দু'চোখের পাতা লেগে এলো টেরও পেলাম না।

সকালে ঘুম ভাঙতে দেখলাম উঠোনে মানুষের ভীড় খানিকটা কমে গেছে। পাশে রুশী ঘুমে বিভোর হয়ে থাকলেও মীনু আপা বা রানী আপাকে দেখলাম না। আমি বাইরে বের হতেই রানী আপা ছুটে এলো। - ঝিমা ভালো হয়ে গেছে। সকালে উঠে বসে সবার সাথে কথাবার্তা বললো। চল, তোকে দেখতে চেয়েছে।

আমরা এক দৌড়ে সিঁড়ি টপকে উঠোন পেরিয়ে ঝিমার ঘরের মেঝেয় হাজির হলাম। মাদুরের উপর ক্লান্ত হয়ে শুয়েছিলো ঝিমা। আমাদেরকে দেখেই চোখ খুললো। তার মুখে মধুর একটা হাসি ফুটে উঠলো। - খোকা। কখন এলিরে তুই। আয় আমার কাছে আয়। রানী, তুই ও আয়। দু'জন দুই পাশে বয়।

আমরা ঝিমাকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ বসে থাকি। ঝিমা কথা খুব একটা বলতে পারে না কিন্তু তার দু'চোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরতে থাকে। - তোদের মায়াতেই যেতে পারলামনারে।

সেদিনই দুপুরের পরে অধিকাংশ মানুষজন বিদায় নিলো। দহলিজ ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা গরুর গাড়ির সংখ্যা কমতে কমতে বিকেল নাগাদ প্রায় শূন্য হয়ে গেলো। শুধুমাত্র মামা বাড়ি থেকে যে গাড়িটা মেয়েদেরকে নিয়ে এসেছিলো সেটাই রয়েছে। ফুপু ও রানী আপা সেটাতেই এসেছে। আমি শুধু মনে মনে প্রার্থনা করছি তারা যেন শীঘ্রই চলে না যায়। সন্ধ্যার দিকে জানলাম গাড়ি নিয়ে নানীরা চলে যাবে। মামা-মামী ও রানী আপা দুই-একদিন থেকে তারপরে যাবে। আলেক মিয়া তাদেরকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। আমার মনটা আনন্দে টগবগ করতে লাগলো। মীনু আপারাও কয়েকদিন থাকবে শুনে আরো ভালো লাগলো।

দাদুর বাড়ির পেছনের বাগানে নানান জাতের আমের গাছ। কাঁচা মিঠা থেকে শুরু করে চালতে পর্যন্ত। একেক আমের একেক রকম স্বাদ। প্রায় প্রতিটা গাছেই ভুরি ভুরি আম হয়েছে। পুষ্ট হয়ে মাত্র পাকতে শুরু করেছে তারা। আমাদের সবচেয়ে প্রিয় আম কাঁচামিঠা। কিন্তু এই গাছটা নারকেলের বাগানের মাঝখানে এবং ঢ্যাংগা লম্বা। আমরা তিনজনের কেউই ধরতে পারি না। নীচ থেকে ঢিল মেরে খুব একটা সুবিধা হয় না। প্রথমত গাছটিতে আম হয় কম, হলেও অনেক উঁচুতে। আমাদেরকে বাধ্য হয়ে আলেক মিয়ার স্মরণাপন্ন হতে হয়। সে নারকেল গাছে ওঠার ওস্তাদ। খাড়া গাছ বেয়ে এমন তর তর করে উঠে যেতে খুব কম মানুষকেই দেখেছি। আলেক মিয়া ঝট করে একদম মগডালে উঠে আমাদেরকে টপাটপ কয়েকটা আম পেড়ে দেয়। সেই আম খোসা ছিলে কুঁচি কুঁচি করে কেটে লেবু পাতা, লবণ, সামান্য দুধ মিশিয়ে জাব করা হয়। তিনজনে কাড়াকাড়ি লাগে। পেছনের পুকুরটার ঠিক শরীর ঘেষে একটা বিশাল আমের গাছ। ছোট ছোট হলুদ রঙের আম হয়। গোসল করতে করতে ঢিল মেরে আম পাড়ি আমরা। নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্ধিতা করে সেই আম ধরবার চেষ্টা করি। পুকুরের অন্য পাড়ে আমাদের আরেকটি খুব প্রিয় আমের গাছ আছে। সেটাকে আমরা সংক্ষেপে ডাকি কলপের গাছ বলে। এই গাছে বড় বড় সবুজ ও লাল মেশানো আম হয়। গাছটা খুব বেশী বড় নয়, আমে তার ডালপালা একেবারে নুয়ে পড়েছে। এই আমগুলো কাঁচা অবস্থায় ততো মজা না হলেও একটু পাকলে অসম্ভব স্বাদ হয়। ইতিমধ্যেই আমরা লক্ষ্য করেছি কিছু কিছু আমে পাক ধরেছে।

ঝিমা ভালো হবার তিন-চার দিন পর হঠাৎ আকাশ ঘন করে মেঘ হলো। মানুষজন সবাই তটস্ত হয়ে যে যার হাতের কাজ দ্রুত সারবার চেষ্টা করতে লাগলো। বাইরে রাখা জিনিষপত্র সব ভেতরে ঢুকে গেলো। রানী আপা বললো - কাল বোশেখী ঝড় হবে মনে হচ্ছে। দেখিস কেমন ঢপা-ঢপ আম পড়বে।

চাচীর কানে কথাটা যেতেই তিনি মার্শাল ল জারি করলেন। - ঝড়ের সময় একটাকেও যেন ঘরের বাইরে যেতে না দেখি।

আমরা নিরুত্তর থাকি। ঝড়ে আম পড়বে আর আমরা ঘরের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকবো এমন অসম্ভব কথা কে কবে শুনেছে? বিশেষ করে গ্রামের তাবৎ বাচ্চা-কাচ্চা, এমনকি বড়রাও তখন বেরিয়ে পড়বে গাছ থেকে পড়া আম টুকবার জন্য তখন আমরা নির্বিকারে বসে থাকতে পারি? দেখা যাবে কাঁচা মিঠা আর কলপের গাছের আমগুলো অন্য মানুষে কুড়িয়ে নিয়ে গেছে। চাচী চোখের আড়াল হতেই আমরা ফিসফিসিয়ে প্ল্যান করতে থাকি। এখন ঝড়টা বেশী রাত হবার আগে হলেই হয়। বিকেল নাগাদ চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। বাতাস পর্যন্ত যেন বইছে না। গ্রামবাসীরা সবাই যে যার বাড়িতে চলে গেছে। চাচু, চাচী ও মামা-মামী দাদুদের ঘরে জমায়েত হয়েছেন। আমরা তিনজন ঝিমার ঘরে শুই। আমরা সেখানেই ঝিমার পাশে গুটিগুটি মেরে বসে আছি। ঝড় আসবে বলে আজকে সবাই একটু আগে আগেই খাওয়া দাওয়া সেরে ফেলেছি। আলেক মিয়া অনেক আগেই গরুর পাল গোয়ালে ঢুকিয়ে সব ঠিকঠাক করে দহলিজ ঘরে ঢুকে পড়েছে। সে মাঝে মাঝে নিজের বাড়িতে যায়। মাঝে মাঝে এখানেই রাত

কাটায়। আজ ঝড়ের রাত বলে দাদী তাকে দহলিজেই থাকতে বলেছেন। গরুগুলো ঝড়ের সময় অসুবিধায় পড়লে তার সাহায্যের দরকার পড়বে। আমরা দহলিজ ঘরে গিয়ে তাকে একবার দেখে এসেছি। সে বিছানা পেতে ফেলে ঘুমানোর সাজ-সরঞ্জাম করছিলো। সারাদিন মাঠে-ঘাটে কাটিয়ে সন্ধ্যায় সে বোধহয় অনেক ক্লান্ত থাকে। বিশাল এক থালা ভাত খেয়ে আমি তাকে সটান বিছানায় চলে যেতে দেখেছি। আজ রাতে অবশ্য তার উপরে আমরা অন্য একটা দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছি। ঝড়ের সময় আশে পাশের গৃহস্থবাড়ির ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে আম কুড়াতে বেরিয়ে পড়ে। গ্রামে গরীব লোকজনও ছেলেমেয়েসহ বাগানে বাগানে ঘোরে। গ্রামে এতো আম, জাম, কাঁঠালের গাছ থাকলেও সিংহভাগ মানুষেরই তাতে কোন অধিকার নেই। তারা কালেভদ্রে সেগুলো ছোঁয়ার সুযোগ পায়। কাল বোশেখী ঝড় হচ্ছে তেমন একটা সুযোগ। আলেক মিয়ার কাজ হচ্ছে চিৎকার করে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া। আমরা কুড়িয়ে আনার পর যত ইচ্ছা কুড়াক তারা। কিন্তু প্রথম দানটা আমাদের সারা চাই। ঝিমার ঘরে বসে বসে নানান ধরনের গল্প করে সময় কাটাচ্ছি। আমাদের দৃষ্টি বাইরে। ঝড় আসছে না কেন? রানী আপা একটু পর পর চিৎকার করে আলেক মিয়াকে ডেকে আশ্বস্ত হচ্ছে যে সে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে না। প্রথম কয়েকবার তার সাড়া পাওয়া গেলেও রাত সামান্য গভীর হতে রানী আপার ডাকের কোন জবাব এলো না আর। রানী আপা মুখ থমথমে করে বললো - গেলো ঘুমিয়ে। ঝড়টা কেন যে ছাই এখনো আসছে না?

ঝিমা ধমক দেয়। - ঘুমা তোরা। ঝড় কখন আসবে তার কোন ঠিক ঠিকানা আছে?

আরো ঘন্টাখানেক বক্ বক করে পরিশেষে আমরা শুয়েই পড়ি। ঝড় বোধহয় আজ রাতে আর হবেই না। সারাদিন আমারও অনেক দৌড়াদৌড়ি গেছে। বালিশে মাথা লাগতেই চোখ বুজে এলো।

হঠাৎ ধাক্কাধাক্কিতে ঘুম ভাঙলো। রানী আপার উত্তেজিত গলা। শুনলাম- ওঠ, ওঠ, ঝড় হচ্ছে। আম পড়ার শব্দ শুনছিস? চোখ খুলে দেখলাম মীনু আপা আর রানী আপা বাইরে যাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ তৈরি। আমিও লাফ দিয়ে বিছানা ছাড়লাম। শো শো করে প্রবল বেগে বাতাস বইছে বাইরে। অন্ধকারে প্রায় কিছু দেখা যায় না। একটা হারিকেন নিয়ে ঝিমার ঘর থেকে বাইরের উঠোনে নেমে এলাম আমরা। ঝিমা ভেতর থেকে চিৎকার করে মানা করছে। কে শোনে কার কথা? আম বাগানে ঢপাঢপ আম পড়ছে, খানিকটা ঢিল পড়ার মতো শব্দ করে। সেই শব্দ শোনার পর স্থির হয়ে বসে থাকা সম্ভব কখনো?

আমরা পেছনের দরজা খুলে বাতাসের তোড় উপেক্ষা করে বাগানে বেরিয়ে আসি। ধুলায় চারদিক ছেয়ে গেছে। আমাদের জামা-কাপড়, চুল বাতাসে পতপত করছে। সোজা সামনে তাকানো একরকম অসম্ভব। একহাতে চোখ ঢেকে মাথা নীচু করে ঝড়ের বেগ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে মেঠো পথ ধরে এগিয়ে চলেছি আমরা। বেশ দূর থেকেই মানুষজনের গলা শুনছি। ইতিমধ্যেই কাজে নেমে পড়েছে অনেকে। আমরা আরো দ্রুত চলার চেষ্টা করি। আমাদের প্রথম গন্তব্য কাঁচামিঠা আম। মীনু আপা ঝুড়ি নিয়েছিলো সাথে। তিনজনে ঝটপট

কতগুলো কুড়িয়ে ঝুড়িতে ভরলাম। অন্ধকারে দৃষ্টি এমনিতেই চলে না, তার উপরে ধুলার উৎপাত। আমাদের ভয় কলপের আমগুলো অন্যেরা এসে কুড়িয়ে না নিয়ে গেলেই হয়।

আমরা আবার ঝড়ের তান্ডবলীলা অবহেলা করে চোখ মুখ ঢেকে ছুটে যাই পুকুরের অন্য পাড়ে। অন্ধকারে কোন রকমে ঠাহর করে এগুতে হয়। সবার আগে হারিকেন হাতে মীনু আপা। তার পেছনে রানী আপার হাত ধরে আমি।

যা ভেবেছিলাম তাই। কলপের গাছে পৌঁছে দেখি গ্রামের কয়েকটা তরুনী ইতিমধ্যেই জুটে পড়েছে। তাদের সাথে পালা দিয়ে কুড়ানোর চেষ্টা করি আমরা। রানী আপা তাদেরকে ধমকে খানিকটা নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। অবশ্য খুব শীঘ্রই আমাদের ঝুড়ি ভরে উঠে। আমরা তারপরও কুড়াই। রানী আপা তার ওড়নার মধ্যে কুড়ানো আম জমাতে থাকে। আমি দুই পকেটে ভরতে থাকি। ইতিমধ্যে ঝড়ের বেগ মনে হয় যেন আরো বেড়েছে। কয়েক হাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকেও পরস্পরকে দেখা দুষ্কর হয়ে পড়েছে। দূর থেকে চাচু-চাচীর কণ্ঠ শোনা যায়। কিছু বোঝা যায় না অবশ্য। মীনু আপা বললো- চল্ চল, ফিরি। আব্বা আম্মা মনে হয় টের পেয়ে গেছে। বকা একটা শুনতে হবে। আমরা বাধ্য হয়ে রনে ভঙ্গ দেই। কিন্তু এই আমের বোঝা নিয়ে দ্রুত হাঁটাও তো এক অসুবিধা। অনেক কষ্টে পথ ঠিক রেখে যখন উঠোনে পৌঁছলাম, দেখি চাচী উগ্রমুর্তি ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রচন্ড বকা দিলেন তিনি। যদিও ঝড়ের শব্দে অধিকাংশই চাঁপা পড়ে গেলো। আমরা ঝিমার ঘরে ঢুকে পড়ে আম গুনতে লেগে যাই। পঁচাশিটা। মন্দ না। আমাদের মুখে হাসি ফোটে।

পরদিন সকালে খুব ভোরে উঠে আমরা আবার বাগানে যাই। ঝড় বহু আগেই থেমে গেছে। রাতের অন্ধকারে আমাদের দৃষ্টি ছিলো সীমাবদ্ধ। ভোরের আলোতে অনেক স্বাচ্ছন্দে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া আরো কিছু আম আমরা টপাটপ কুড়িয়ে ফেললাম। সব মিলিয়ে প্রায় দেড়শ আম হলো। সব আম অবশ্য আমরা নিলাম না। সব গাছের আম মজা নয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে আমাদের আম কুড়ানোর কথা শুনে মা আমাকে ভয়ানক বকাঝকা করলেন। কিন্তু কাঁচামিঠা আম তাকে জাব করে দিতে গপাগপ এক থালা শেষ করে ফেললেন। –এই আমগুলো তোরা কাল রাতে কুড়িয়েছিলি? বাহ্ ভালোই তো।
আমি মুখ বাঁকাই, বকা দেবার সময়তো খেয়াল থাকে না। রাজ্যের মানুষের সামনে বেইজ্জতি।
মীনু আপারা চলে গেলো দু'দিন পরে। দেশে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। যদিও আমাদের এই অঞ্চলে এখনও যুদ্ধের প্রভাব তেমন একট নজরে পড়ছে না, কিন্তু তারপরও ঘর-বাড়ি ফেলে দূরে দীর্ঘদিন থাকাটা সমীচিন নয়। কখন কি হয়। বড়দের সব কথা পরিষ্কার না বুঝলেও এটুকু বুঝি যে গ্রামের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে নাম লিখিয়েছে। তারা সব ভারতে চলে গেছে ট্রেনিং নিতে। আমাদের গ্রাম থেকে ভারতের বর্ডার মাত্র দুই-তিন মাইল। যুদ্ধ বড় সড় করেই শুরু হবে মনে হয়। ভারত এখনও সরাসরি সমর্থন জানায়নি কিন্তু নানানভাবে সাহায্য সহযোগিতা করছে। বহু মানুষ ভয়ে বাংলাদেশের সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে গিয়ে ঢুকেছে। সেই রিফিউজিদেরকে আশ্রয় দিতে হয়েছে ভারতকে। মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধের কলাকৌশল শিখাতেও

তারা সহায়তা করছে। আমাদের গ্রামেরই বেশ কয়েকটি ছেলে ট্রেনিংএ গেছে। আলেকের বড় ভাই মতিও তাদের দলে। দাদুর বাড়িতে মজুরের কাজ করতো রহিম ও লিয়াকত। তারাও নাকি মতি ভাইয়ের সাথে গেছে। যদিও গ্রামের মানুষদের মধ্যে মতদ্বৈততা আছে। শোনা যায় অনেকেই নাকি মুক্তিযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে অন্য ধরনের কাজ শুরু করেছে। হাতে অস্ত্র পেয়ে তারা গৃহস্থ বাড়িতে ডাকাতি পর্যন্ত করছে। রানী আপার কাছে শুনলাম, বশীর নাকি মুক্তিযুদ্ধের নাম করে এমনই একটা দলে গিয়ে ভিড়েছে। রানী আপা খুবই ভয়ে ভয়ে থাকে। কে জানে বশীরের মাথায় কি বদ মতলব আছে। বাধ্য হয়েই মামাকে বশীরের কথা বলতে হয়েছিলো রানী আপাকে। মামা তারপর থেকে একা কোথাও যেতে দেয় না তাকে। বাড়িতে নতুন বন্দুকও কিনেছেন। কিন্তু একটা বন্দুক দিয়ে শেষ রক্ষা হবে কি? নানারও বন্দুক আছে কিন্তু তার বয়েস হয়েছে। তাছাড়া প্রায় সময়েই নানান কাজে বাড়ির বাইরে থাকতে হয় তাকে।

মীনু আপারা চলে যাবার পর রানী আপার সাথে সুখ দুঃখের কথা বলার সুযোগ হয়। বশীরকে নিয়ে তার উদ্বেগ আমি গভীরভাবে অনুভব করি। মাত্র বারো বছর বয়েসেই তাকে যে এই জাতীয় ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করতে হচ্ছে ভেবে অসম্ভব ক্রোধ অনুভব করি। তার দিকে তাকিয়ে 'বড়দের' কোন কিছুই দেখি না। বশীরের মতো এক যুবক কেন এই অল্প বয়েসী মেয়েটাকে উত্যক্ত করছে? রানী আপাকে কথাটা জিজ্ঞেস করতে সে হাসলো।

- গ্রামের কিছুইতো জানিস না। আমার বয়েসী কত মেয়ের বিয়ে হচ্ছে। সতেরো আঠারোতেই দুই-তিন বাচ্চার মা। এখানে এটাই রীতি। আমি বাইরে চলে যাবো। বাবাকে বলেছি আমাকে খুলনায় ফুপুর ওখানে পাঠিয়ে দিতে। যুদ্ধের সময় গ্রামের দিকে কি অবস্থা হয় কে জানে। জানিস তো, যুদ্ধ লাগলে মেয়েদের হয় সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা। শত্রুরাও অপমান করে, নিজের দলের লোকও করে। আব্রু নিয়ে তাদের পালানোর পথ থাকে না।

আমি মন খারাপ করে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকি। যুদ্ধ ব্যাপারটা তখনও সঠিক মাথায় ঢোকে না। বাংলাদেশ-পাকিস্তান নিয়ে কেন এই সমস্যা ঠিক বুঝতে পারি না। কিন্তু রানী আপার সমুহ ক্ষতির সম্ভাবনায় একাধারে রাগ ও ক্ষোভ হয়।

কয়েকদিনের মধ্যেই ঝিমার শরীর সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেলো। সে আবার লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটতে শুরু করলো। ব্যাপারটা অবশ্য বাড়ির অন্যদের জন্য খুব সুখপ্রদ নয়। ঝিমার একটা বদভ্যাস হচ্ছে সকলের কাজে ত্রুটি ধরা। তার ধারালো জিভের হাত থেকে দাদী থেকে শুরু করে কাজের মানুষগুলির কারোরই রক্ষা নেই। বিছানায় শুয়ে থাকলে তার পক্ষে অন্যদেরকে ত্যাক্ত বিরক্ত করবার তেমন সুযোগ হয় না। সে উঠোনময় লাঠিতে টকাটক শব্দ তুলে হাঁটতে শুরু করতেই সকলের বিরক্তির উদ্রেক হতে লাগলো। কিন্তু সকলকে অবাক করে দিয়ে ঝিমা হঠাৎ করেই অনেক পাল্টে গেলো। সে অধিকাংশ সময় কাটাতে লাগলো আমার আর রানী আপার সাথে। আলেক গরু নিয়ে বিলে চলে যাবার পর আমরা তিনজন পেছনের সব্জি বাগানে চলে যাই। সব্জি তুলতে তুলতে নানান ধরণের গল্প হয়। ঝিমা যে এতো ধরনের গল্প জানে ধারণা ছিলো না। অধিকাংশই রাজ-রাজড়া-জমিদারদের গল্প। কিন্তু কিছু কিছু ভয়ের গল্পও

আছে। বিশেষ করে দাদু বাড়ির পেছনের পুকুরটি নিয়ে সে আমাদেরকে যে গল্প শোনালো তাতে পরবর্তি কয়েকটা রাত আমার ঘুমাতে কিছু সমস্যাই হলো।

কয়েক পুরুষ আগে আমাদের পৈতৃক ভিটা এখানে ছিলো না। এখানে তখন বাস করতো বিষ্ণু ডাকাত বলে এক ভয়াবহ লোক। সে দিনের বেলায় ভালো মানুষ সেজে থাকতো, চাষাবাদ করতো। তার নিজের অল্প কিছু জমি ছিলো। তার স্ত্রী সুলেখা ছিলো মাটির মানুষ। স্বামীকে খুবই ভালোবাসতো। স্বামীর কথার অন্যথা হতো না। বিষ্ণুও তাকে খুবই ভালোবাসতো। অন্ত ত সবাই তার ব্যবহারে সেটাই মনে করতো। কিন্তু বিষ্ণু ছিলো বড় অভিনেতা। সে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে রাতের বেলা নিজের ভোল পাল্টে ফেলতো। প্রতি মাসেই কয়েকটা রাতে সে তার ডাকাত বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়তো বড় বড় গৃহস্থবাড়িতে ডাকাতি করতে। বিশাল রামদা নিয়ে তারা যখন হ-রে-রে করতে করতে গৃহস্থ বাড়ির দরজা ভেঙে আঙিনায় ঢুকতো ভয়ে সবার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যেতো। বিষ্ণু তাদেরকে বলতো সব সোনা-দানা-হীরা-জহরত তার থলিতে ভরে দিতে। কেউ আপত্তি করলে সাথে সাথে তার কল্লা দু'ফাঁক। সঙ্গী-সাথীদেরকে তাদের ভাগ দেবার পর নিজের অংশ বিষ্ণু বড় বড় ঘড়ার মধ্যে ভরে মাটির নীচে একটা গুপ্তঘরে লুকিয়ে রাখে। ঘড়া যখন ভরে যায় তখন ভালো করে ঘড়ার মুখ বেঁধে পুকুরের নীচে ডুবিয়ে দেয়। তাতে কারো কখনো সন্দেহ হলেও কোন কিছু প্রমাণ করতে পারবে না। বিষ্ণুর ইচ্ছা চার-পাঁচ ঘড়া পূর্ণ হলে সে সবগলো তুলে অন্য কোথাও গিয়ে বিশাল জমিদারি খুলে বসবে। তার স্ত্রী সুলেখাকে সে এইসব কিছু না বললেও, সুলেখার সন্দেহ হয়। মাঝে মাঝেই রাতে ঘুম ভাঙলে সে তার স্বামীকে পাশে দেখে না। জিজ্ঞেস করলে বিষ্ণু বলে তার ঘুম আসছিলো না। সে নদীর দিকে হাঁটতে গিয়েছিলো। সুলেখার বিশ্বাস হয় না। একদিন শেষ রাতে বিষ্ণু ফিরে এসে তার গুপ্ত কুঠরিতে সোনা-দানা রেখে যখন বের হচ্ছে তখন সুলেখার মুখোমুখি পড়ে গেলো। বাধ্য হয়ে স্ত্রীর কাছে রহস্য ফাঁস করতে হলো তাকে। কিন্তু সে খুব ঠান্ডা গলায় হুমকিও দিলো - যদি কাউকে বলিস তোকে জানে শেষ করবো।

সুলেখা স্বামীকে ভালোও বাসে, ভয়ও পায়। বিশেষ করে তার স্বামীর এই ভয়াবহ রূপ আচমকা আবিষ্কার করে সে আরো ঘাবড়ে গেলো। কাউকে বলা তো দুরের কথা, সে বাড়ির বাইরে যাওয়াই বন্ধ করে দিলো। বিষ্ণু নিশ্চিন্তে তার ডাকাতি চালিয়ে যেতে থাকে। তার পাঁচ ঘড়া পুরতে আর অল্প বাকি। সে ঠিক করলো এটাই তার শেষ ডাকাতি। বহু দুরে এক গেরস্থ বাড়িতে মাঝরাতে হৈ হৈ - রৈ রৈ করে পাঁচ-ছয়জনের ডাকাত দল নিয়ে হামলা দিয়ে পড়লো সে। কিন্তু গেরস্থের অপূর্ব সুন্দরী অবিবাহিত মেয়েটিকে দেখে তার সবকিছু ওলোটপালট হয়ে গেলো। সোনা-দানা শুধু নয় আসবার সময় মেয়েটিকেও হাত-পা-মুখ বেঁধে সাথে নিয়ে এলো। তার স্ত্রী সুলেখার চোখ এবারে কপালে উঠলো। বিষ্ণু বললো - এ মেয়েটি আমাদের সাথে থাকবে। আমি তাকে বিয়ে করবো।

সুলেখা তিক্ত কণ্ঠে বললো - এক স্ত্রী থাকতে তুমি অন্য স্ত্রী কিভাবে গ্রহণ করবে?

বিষ্ণু অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললো - এটা আমি চিন্তা করিনি। ঠিক আছে। কাল রাতে আমি তাকে ফেরত দিয়ে আসবো। আজকের দিনটা তাকে মাটির নীচের গুপ্ত ঘরে লুকিয়ে রাখি।

সুলেখা স্বামীর কথায় আশ্বস্ত হলো। কিন্তু বিষ্ণুর মাথায় অন্য পরিকল্পনা ঘুরছে। পরদিন রাতে খাবার সময় সে স্ত্রীর খাবারে বিষ মিশিয়ে দিলো। সুলেখা সেই বিষ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লো। বিষ্ণু এবার তার পাঁচ নম্বর ঘড়ার সাথে সুলেখাকে বেঁধে পুকুরে ডুবিয়ে দিলো। তার ইচ্ছা এবার অন্য মেয়েটিকে বিয়ে করে ধীরে সুস্থে ভিন্ন কোন গ্রামে চলে গিয়ে কয়েকশ' বিঘা জমি কিনে দালান-কোঠা বানাবে। যদিও মেয়েটিকে সে তুলে নিয়ে এসেছে, তারপরও বিয়ে হয়ে গেলে স্বামীর কোন ক্ষতি সে করতে পারবে না।

যথারীতি মেয়েটিকে সে ভয় দেখিয়ে বিয়ে করলো। সবাই জানলো সুলেখার মাথা খারাপ হয়ে যায় এবং সে কাউকে কিছু না বলে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। বিষ্ণু ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে তার পছন্দমত একটা জায়গা বাছাই করে।

পরিশেষে এক রাতে সে পুকুরে নামে তার সোনা-দানা ভর্তি ঘড়াগুলো তোলার জন্য। প্রথম চারটি ঘড়া তুলে পুকুরের পাশে রেখে সে পঞ্চম ঘড়াটা তুলবার জন্য ডুব দেয়। তার স্ত্রীর লাশ আজও ঘড়ার সাথে বাঁধা। লাশ পচতে শুরু করেছে। বিষ্ণু দড়ি খুলে দিয়ে ঘড়াটাকে পৃথক করবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে সুলেখার পরনের শাড়ী সাপের মতো বিষ্ণুকে পেঁচিয়ে ধরে। বিষ্ণু যতই চেষ্টা করে উপরে উঠতে, শাড়ীটা তাকে ততই মাটির দিকে টানে। ধস্তাধস্তি করতে করতে একসময় দম বন্ধ হয়ে মারা যায় সে। পরদিন সকালে মানুষজন এসে দেখে পুকুরের পাড়ে চার ঘড়া ভর্তি সোনা-দানা কিন্তু পুকুর চষেও বিষ্ণু, সুলেখা বা পঞ্চম ঘড়াটার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ সেই ঘড়াটা নাকি পানির উপরে ভেসে ওঠে আজও। ঘড়ার সাথে বাঁধা সুলেখার লাশ এবং সুলেখার শাড়ীতে পেচানো বিষ্ণুর শরীর। সেই দৃশ্য যে দেখে সে মাত্র এক সপ্তাহ বাঁচে।

এই গল্প শুনবার পর পেছনের পুকুরে যাওয়াই বন্ধ করে দিলাম আমি। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর ঐ এলাকার ধার কাছ দিয়েও যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

রানী আপা চলে গেলো আরো কয়েকদিন পর। আমরাও দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গেলাম। মায়ের অবস্থা মোটেই ভালো না। তার পেটের মধ্যে যে বাচ্চাটা বড় হচ্ছে সে নাকি খুব শীঘ্রই বেরিয়ে আসবে। এই অবস্থায় আবার এতোখানি পথ ভেঙে খুলনা যাওয়াটা ঠিক হবে কিনা চিন্তার বিষয়। গ্রামাঞ্চলের পরিস্থিতি যেহেতু তেমন খারাপ নয় সেহেতু বাচ্চাটা না হওয়া পর্যন্ত থাকলেই বা ক্ষতি কি? দাদু, দাদী ও ঝিমা মাকে অনেক বোঝালেন। মায়ের বোধ হয় ইচ্ছা ছিলো তার বোনের বাসাতে যাওয়া কিন্তু শরীরের অবস্থার কথা চিন্তা করে তিনি গ্রামে থাকাই মেনে নিলেন। বাবার কাছ থেকেও ইদানীং আর কোন খবর আসেনি। পাকিস্তানে তিনিও কি পরিস্থিতিতে আছেন জানার কোন উপায় নেই। তার সাথে মিলিত হবার সময় যতই পিছিয়ে যাচ্ছে মায়ের মুখ ততই মলিন হচ্ছে। ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারি। আমাদেরকে নিয়ে যেতে বাবার কেন এতো দেরী হচ্ছে ভেবে একটু রাগও হয়।

# ডাকাত! ডাকাত!

রানী আপারা চলে যাবার পর বোধহয় মাত্র সপ্তাহ খানেক পেরিয়েছে। ঝিমার শরীর খুবই ভালো। সকলকে ত্যাক্ত বিরক্ত করে ছাড়ছে সে। মায়ের অবস্থা সুবিধার নয়। অধিকাংশ সময় শুয়ে বসেই কাটান। আমি আর রুশী দাদীর সাথে বাগানে বাগানে ঘুরে শাক-সব্জি, ফল কুড়াই। সময় খুব একটা দ্রুত না কাটলেও বিশেষ মন্দ লাগছিলো না। বিশেষ করে মা খানিকটা গৃহবন্দী হয়ে পড়ায় খবর্দারি করবার সুযোগ বেশী পাচ্ছিলেন না। আমি মনে মনে বেশ আনন্দই অনুভব করছি। ঝিমার কাছে জেনেছি বাচ্চা হবার পরও মাসখানেক মাকে হয়তো সাবধানে থাকতে হবে। যার অর্থ কম করে হলেও দুই-তিন মাস আমার মুক্তি। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশতঃ আমার আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হলো না।

এক রাতে দাদুর বাড়িতে ডাকাত পড়লো। আগেই বলছি দাদুর বাড়ি চারদিক দিয়ে উঁচু মাটির পাঁচিলে ঘেরা। দাদুদের ঘর, ঝিমার ঘর, রান্নাঘর এবং দহলিজঘর সব পাঁচিলের ভেতরে। দাদুর চারটা ধানের গোলা। সবগুলিই দাদুদের ঘর ও দহলিজ ঘরের মাঝের উঠোনে। প্রতিদিন রাতে গরু-ছাগল সব গোয়ালে ঢুকে যাবার পর অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সাথে সাথেই মজবুত প্রবেশ দ্বারটা ছিটকিনি লাগিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়। বাইরে থেকে যেন সহজে দরজা না ভাঙা যায় সেজন্য একটি পুরু কাঠের তৈরি লাঠিকে দরজায় আড়াআড়িভাবে হুড়কার উপরে বসিয়ে দেয়া হয়। হাঁস-মুরগী তাদের খুপরিতে ঢুকে গেলে পেছনের বাগানের দিকের দরজাটাও ঝটপট বন্ধ করে দেয়া হয়। কাজের লোকজনেরা অন্ধকার হবার আগেই যে যার বাড়িতে চলে যায়। দিনকাল ভালো নয়। গ্রামাঞ্চলে অন্ধকার হবার সাথে সাথেই চারদিকে ভীতিকর নীরবতা নেমে আসে। তারপরে চারদিকে চোর-ডাকাত, গুন্ডা বদমায়েশের ভয়তো রয়েছেই।

দাদুর বাড়িতে বহু বছর আগে নাকি একবার ডাকাত পড়েছিলো। তখন দেশের অবস্থা ভালো ছিলো না। অনেক মানুষেরই পেটে ভাত ছিলো না। ডাকাতেরা গোলার ধান নিয়ে গিয়েছিলো। কারো কোন ক্ষতি করেনি। পুলিশে খবর দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু কেউ ধরা পড়েনি। যদিও দাদু বেশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ তারপরও তার অবস্থা এমন নয় যে ডাকাতেরা তাকে বিশেষ মূল্য দেবে। তাদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে নগদ টাকা এবং সোনা-দানা। যেহেতু অর্থ ও গহনা লুকিয়ে ফেলা সহজ। দাদুর জমিজমা প্রচুর থাকলেও নগদ টাকা পয়সা প্রায় থাকে না বললেই চলে। দাদী বা ঝিমার গহনা বলতে দু'য়েকভরি প্রাচীন ডিজাইনের সোনার অলংকার। সেসব নেবার জন্য কেউ রাত বিরেতে হামলা চালাবে এমন চিন্তা কারো মাথায় ভুলেও আসবে না।

আমরা খাবার দাবার সেরে সবাই রাত আটটা নটার দিকে বিছানায় চলে যাই সেই রাতে। ঝিমার গল্প শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে যাই খেয়ালও নেই। হঠাৎ প্রচন্ড গোলমালের শব্দে লাফিয়ে বিছানায় উঠে বসি। ঝিমাও প্রায় একই সময়ে উঠে বসলো। পরিষ্কার শুনতে পাই বাইরের উঠোনে চার-পাঁচটা পুরুষ কণ্ঠের ভয়ংকর হুংকার। - এই বুড়া দরজা খোল। বাইরে আয়।

আমার বুকের মধ্যে হাতুড়ির মতো উঠছে নামছে হৃৎপিন্ডটা। মনে হচ্ছে যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে। আমি ঝিমাকে সজোরে চেপে ধরলাম। ঝিমাও মনে হলো প্রচন্ড ঘাড়বে গেছে। সে আমাকে জড়িয়ে ধরে ফিসফিসিয়ে বললো - ডাকাত পড়েছে। ডাকাত! চুপ করে বয়। বাইরে আবার হুংকার শুনি। - দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকতে হবে নাকি। এই মোড়ল। বাইর হ জলদি।

দাদুর ঘরের দরজা খোলার শব্দ পেলাম। দাদু ধীরে ধীরে উঠোনে বেরিয়ে এলেন। তার হাতে হারিকেন। তার কৃশ শরীরটিকে খুবই ম্লান দেখায়। ঝিমার ঘরে আধখোলা জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম টর্চের আলোতে উঠোনটা দিনের আলোর মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে যেন। তার মধ্যে কয়েকজন মুখে গামছা বাঁধা লোক ব্যস্ত ভঙ্গীতে পায়চারী করছে। দাদুকে দেখেই একজন তার দিকে এগিয়ে গেলো। মনে হলো সেই এই দলের সর্দার। সে বাজখাই গলায় বললো - ঘরে টাকা-পয়সা, গহনাগাটি যা আছে সব নিয়ে আয়। দশ মিনিট সময় দিলাম। তারপর যদি ঘর থেকে না বের হোস, সব কটার গলা কাটবো। তার শরীরের পাশে ঝুলতে থাকা লম্বা রামদাটা দাদুর মুখের সামনে দোলালো সে।

দাদু মোলায়েম কণ্ঠে বললেন - টাকা-পয়সা, সোনা-দানা তো তেমন কিছু নেই বাবা। বুড়ীর দু'য়েকভরি সোনা আছে। ঘরে শ' দুই টাকা আছে। তাতে যদি তোমাদের চলে তাহলে নিয়ে যাও। তার কথা শেষ হবার আগেই দাদী ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তার হাতে ছোট্ট একটা পুটুলী। সেটা তিনি উঠোনে নামিয়ে রাখলেন।

- এই আমার সব গয়না। যাও নিয়ে যাও তোমরা। টাকা দু'শো দিয়ে দাও খোকার দাদু। ওদের রাগিও না।

ডাকাতের সর্দারটা অসহিষ্ণুভাবে তার দলের বাকিদের দিকে তাকালো। বোঝা গেলো সে খুবই বিরক্ত হয়েছে। পেছনে দাড়িয়ে থাকা সাঙ্গদের মধ্যে থেকে একজন হঠাৎ কথা বলে উঠলো। - আর্মির বউ আছে। গামছার নীচ দিয়ে এলেও কণ্ঠস্বরটা পরিচিত লাগলো। ঝিমা ফিসফিস করে বললো - লিয়াকতের গলা না? গত বছর ধান মাড়াইয়ের সময়ে আমাদের উঠোনে কাজ করে গেছে। হারামজাদা, ডাকাত নিয়ে আসছে।

লিয়াকত ভাইকে আমি কয়েকবার দেখেছি। লাজুক ধরনের মানুষ। বয়েস বিশ-একুশের বেশী হবে না। সে কেন ডাকাত নিয়ে আসবে ব্যাপারটা মাথায় ঢুকলো না। তাছাড়া আর্মির বউ বলতে সে কাকে বোঝাচ্ছে সেটাও পরিষ্কার হলো না।

উঠোনে দাদু ও দাদীকে এবার বিচলিত মনো হলো। দাদী করুন কণ্ঠে বললেন - সে আট-ন' মাসের পোয়াতি। তারও হাতে আর কানে ক' ভরি সোনা। সেটাই যদি তোমরা চাও আমি গিয়ে নিয়ে আসি। তোমরা বাবারা এখানে দাঁড়াও। আমি যাবো আর আসবো .....

সর্দার সন্দেহভাজন চোখে দাদীকে পরখ করলো। - না, তুই এখানে দাঁড়া বুড়ি। আমি গিয়ে দেখি।

দাদু এবার রুখে দাঁড়ালেন। –খবরদার, আমার বাড়ির বউয়ের গায়ে যদি হাত দিয়েছিস .....

সর্দার দাদুর গলার চেপে ধরলো। - কি করবি তুই বুড়া? একদম জানে শেষ করে দেবো। এই, তোরা পাহারা দে এখানে, কেউ চিৎকার করলে দিবি কল্লা ফেলে।

সে সদর্পে সিঁড়ি বেয়ে দাদুদের ঘরের দিকে রওনা দিলো। এবার আমার টনক নড়লো। তারা তো মায়ের কথা বলছে। মুহুর্তে আমার শরীরে যেন একটা বিদ্যুতের প্রবাহ বয়ে গেলো। আমি ঝিমার হাত ছাড়িয়ে লাফিয়ে বিছানা থেকে নামলাম। দরজার হড়কা খুলে এক দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। গলার সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে বললাম - খবরদার আমার মায়ের কোন ক্ষতি করবে না। আমি বড় হয়ে সবক'টাকে খুন করবো। লিয়াকত ভাই, আমি পুলিশকে বলে দেবো তুমি ডাকাত নিয়ে এসেছো।

মুহুর্তের জন্য গভীর নীরবতা নেমে এলো উঠোনে। সর্দার সিড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে আমাকে দেখছে। সে হঠাৎ তীক্ষ্ন কণ্ঠে বললো - লিয়াকত হারামজাদা, এই পিচিচ পর্যন্ত তোকে চেনে। শেষ কর ঐটাকে।

আমার পাশে ঝিমা এসে দাঁড়িয়েছে। তার কণ্ঠস্বর ভয়ানক উঁচু। আমার ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিতে সর্পিনীর মতো ফুঁসে উঠলো সে। সারা গ্রাম কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠলো - ওর গায়ে যদি তোরা হাত দিস।খোদার দিব্যি দিয়ে বললাম তোদের গুষ্টিসহ সব শেষ হবে। তোদের ছেলেপিলেরা সব প্লীহা হয়ে একদিনে মরে যাবে। তোদের ঘর দুয়ারে আগুন লাগবে। তোদের জমিজমায় ইঁদুরের বসত হবে .....

পাঁচিলের বাইরে হঠাৎই বেশ মানুষের সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো। দূরে আরো কিছু কণ্ঠস্বরের চিৎকার, ডাকাডাকি। বোঝা গেলো মোড়ল বাড়িতে যে ডাকাতি পড়েছে সেটা প্রকাশ হয়ে গেছে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে গ্রামবাসীরা সবসময়েই যার কাছে যা অস্ত্র আছে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

ডাকাতদলের ভেতর থেকে একাধিক কণ্ঠ কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠলো - পালাই ওস্তাদ। ধরতে পারলে জানে মারবে। সর্দারকেও ভীত সন্ত্রস্থ মনে হলো। তারা যতই বিভীষিকাময় হোক শত শত গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে জীবিত ফিরে যাবার সম্ভাবনা খুবই কম। আর গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ার অর্থ মর্মান্তিক মৃত্যু। সে একদৌড়ে সিড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলো।

- পেছনের দরজা দিয়ে পালাতে হবে। এই লিয়াকত, খিড়কির দরজা কই?

লিয়াকত খিড়কির দরজার দিকে দৌড় দিলো। তার পিছু পিছু বাকিরাও ছুটলো। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দরজা খুলে পেছনের বাগানে তাদের ছুটন্ত পদক্ষেপ হারিয়ে গেলো। সদর দরজায় গ্রামবাসীদের করাঘাত শুনতে পাচ্ছি। দাদু গিয়ে দরজা খুললেন।

শহীদ চাচা লম্বা বাঁশের লাঠি হাতে সবার সামনে দাঁড়িয়ে। একটা বটি হাতে চাচী ঠিক তার পাশে। পেছনে আলেক মিয়া একটা তীক্ষ্নধার বর্শা হাতে। তাদের সঙ্গী কম করে হলেও দশ-পনেরোজন পুরুষ-নারী। এরা সবাই মোড়ল বাড়িতে কাজকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করে।

বিপদে তারাই ছুটে এসেছে সবার আগে। দাদু শহীদ চাচাকে জড়িয়ে ধরলেন। তার কণ্ঠ কান্নায় বুঁজে এলো। হারামীরা পালিয়েছে। ঠিক সময়েই এসেছো তোমরা।
শহীদ চাচা বললেন - আর চিন্তা নাই মোড়ল সাব। আমরা সারারাত বাড়ি পাহারা দেবো।
অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আশে পাশের বাড়িগুলো থেকে আরো তিরিশ-চল্লিশজন লাঠি-সোঠা নিয়ে হাজির হলো। এই দলে গ্রামের বেশ কিছু যুবকেরা আছে। তারা সাহস করে ডাকাতদের পিছু নিলো। শহীদ চাচারা সবাই বাকি রাতটুকু আমাদের উঠোনে কাটালো। ঝিমা আমাকে শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘরের দরজা বন্ধ করে বিছানায় বসে থাকলো। আমি সুযোগ বুঝে একবার মাকে দেখে এসেছিলাম। এতো হৈ-চৈয়ে মা খুবই ঘাবড়ে গিয়েছিলো। তার চোখ মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। দাদী তার পাশে বসে তাকে সান্তনা দিচ্ছেন। মা কান্নাস্বরে বললেন - আমি কালই খুলনা চলে যাবো। আর একটা রাতও এখানে না।

পরদিন সকাল হতেই দাদু আমাদেরকে খুলনা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে লাগলেন। ঠিক হলো তিনি নিজেই আমাদের সাথে যাবেন। দুপুরের দিকে ঝটপট জিনিষপত্র গুছিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আলেক চললো আমাদেরকে কালিগঞ্জ পৌঁছে দিতে। তার গরুর পাল সে একটি ছেলেকে দিয়ে গেলো। ঝিমা আমাকে জড়িয়ে ধরে অনেক কাঁদলো। - আবার দেখা হবে তো রে তোর সাথে, খোকা? কবে আসবি আবার? বেঁচে থাকবো তো?

তার কান্না দেখে আমারও চোখ ভিজে ওঠে। বিড়বিড়িয়ে কিছু একটা বলে চলন্ত গরুর গাড়ির পিছু দৌঁড়াই। দাদু তার সাইকেল নিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। পিছু ফিরে তাকিয়ে দেখি দাদী, ঝিমাসহ গ্রামের অনেক পুরুষ-নারী নির্বাক মুখে দাঁড়িয়ে। কেন যেন তাদের সবাইকে ভয়ানক আপন মনে হয়। মনে হয় নিজের ঘর ফেলে কোথায় কোন দূরে চলেছি। দাদু বাড়ি ঘিরে থাকা গাছপালার বনানী, বাগান, আম, জাম, কাঠালের গাছগুলোকে পর্যন্ত অসম্ভব আপন মনে হয়। কে জানতো গাছ-পালারও এমন মায়া থাকে। আমি দাদুর সাইকেলে চেপে বসি। মেঠো পথ ে বয়ে মায়ের গরুর গাড়ির পাশে গতি মিলিয়ে ধীরে ধীর এগিয়ে চলি। পিছে পড়ে থাকে স্মৃতিমধুর এক নীড়।

---

শুজা রশীদ, টরেন্টো, কানাডা, ১৬/০৩/২০০৬

বিঃ দ্রঃ
জনাব শুজা রশীদ প্রবাসে বসে স্বদেশে নিজের হারানো দিনগুলোকে নিয়ে 'দামামা' নামে একটি বই লিখেছেন। আসছে মে - ২০০৬ তিনি তা বই আকারে ছাপতে যাচ্ছেন। তার আগে আমাদের কর্ণফুলী'তে তাঁর এ অপ্রকাশিত বইটি ধারাবাহিকভাবে আমাদের অগনিত পাঠকদের জন্যে তিনি পরিবেশন করছেন। প্রবাসী ব্যস্ততায় লেখা তাঁর এ প্রকাশিতব্য বইটি পড়ে কেমন লাগছে পাঠকরা আমাদের ইমেইল করে জানালে আমরা তাঁকে সাথে সাথে পাঠকদের মতামত জানিয়ে দেব।